সংবাদ

তারিখ ... 14 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণ প্রয়োজন

শ্যামল কুমার সরকার

শিক্ষা লাভের অধিকার আধুনিক ও কল্যাণ রাষ্ট্রের নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার। আমাদের সংবিধানের ১৭ ধারায় বৈষম্যহীন শিক্ষার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। দেশে বিরাজ করছে শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা। শতভাগ প্রাইভেট, শতভাগ সরকারি এবং এমপিওভুক্ত ধারায় বিভক্ত আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের আগের হিসাব অনুযায়ী দেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরে ২৭, ৬৪৩টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। আর একই পর্যায়ে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ৬০০টি। এছাড়া কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এমপিও বিহীন। অর্থাৎ সরকারের পুরো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি নগণ্য। এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক নৈরাজ্যের পরিবেশ বিরাজমান। মাসিক ছাত্র বেতন প্রতিষ্ঠান ভেদে ৬০/- হতে ৬০০০/- টাকা। দেশে ছাত্র বেতনবিহীন প্রতিষ্ঠানও আছে (প্রতিষ্ঠান ও জীবন বাঁচাতে শুধুমাত্র এমপিও সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়)। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও তদ্রূপ। অথচ স্তরভেদে একই শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসের শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষকরা পরিচালনা করে আসছেন। শিক্ষকরাই মূল্যায়ন করছেন পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র। দায়িত্ব পালন করছেন পাবলিক পরীক্ষার কক্ষে।

কিন্তু প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার দিক থেকে বেশিরভাগ শিক্ষক যুগের পর যুগ বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে শিক্ষার মানের হেরফের। কিন্তু এভাবে কি চলতেই থাকবে? এ জীর্ণদশা হতে বের হবার কোন উপায়হ কি নেই? এ ব্যাপারে ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাক। পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিকীকরণ (Provincialization) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাডেমিকভাবে স্বনামধন্য ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি (Government) করা হয়েছিল। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ (বিএম কলেজ), খুলনার ব্রজলাল কলেজ (বিএল কলেজ), রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ, পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, বাগেরহাটের প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ (পিসি কলেজ), বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ এবং দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এ প্রক্রিয়ায় সরকারি হয়। একই প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যায়ে সরকারি কলেজের সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৩৪ এ। এটি ছিল মূলত পাকিস্তানের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার একটি কূটকৌশল। পাকিদের পূর্বসূরী ব্রিটিশদের ভাগ কর ও শাসন কর (Divide and Rule) নীতির অনুসরণ। শিক্ষার বিস্তার কখনোই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

কখনো কখনো নামিদামি প্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা ও রাজনীতি সচেতন শিক্ষকদের শায়েস্তা করতেও প্রতিষ্ঠান সরকারি করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ১ আগস্ট ঢাকার অভিজাত জগন্নাথ কলেজ সরকারিকরণ সেভাবেই হয়েছিল বলে ইতিহাস সাক্ষী দেয়। সরকারিকরণের প্রতিবাদে জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অজিত গুহ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবিএম আবদুল লতিফ পদত্যাগ করেছিলেন। পাঠক, একবার ভেবে দেখুন প্রতিবাদী চেতনার নমুনা! পাকিস্তানি পদ্ধতির পরে এলো স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পদ্ধতি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬, ১৬৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একই সঙ্গে একই দিনে সরকারি করেছিলেন। ১৯৭৫ সাল ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত না হলে হয়তোবা বাংলাদেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠানই আজ বেসরকারি থাকতো না। জাতির জনকের হত্যার পর দীর্ঘ ২১ বছর উল্টো পথে চলেছে স্বদেশ। ২০০১ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫১-তে।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে সরকারি কলেজ ও সমমানের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০৫। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে দেশের জেলা শহরের ১৮টি মহিলা কলেজ সরকারি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় শাসনামলেও তিন দফায় ১৮টি কলেজ সরকারি করা হয়। এছাড়াও খাগড়াছড়ি ও বান্দারবান জেলা সদরে সরকারি অর্থায়নে সম্পূর্ণ নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করে দুটি মহিলা কলেজ গড়ে তোলা হয়। বেসরকারিভাবে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে উক্ত কলেজ দুটি সরকারি করা হয়। ২০১৩ সালের শিক্ষা আইনে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১টি কলেজ সরকারিকরণ করা হবে বলে উল্লেখ আছে। শেখ হাসিনার তৃতীয় দফার শাসনকালে আবার শুরু হয়েছে সরকারিকরণ প্রক্রিয়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার সম্প্রচার মাধ্যম টেলিভিশনে উপজেলাভিত্তিক স্কুল-কলেজ সরকারি করার কথা বলেছেন। সম্প্রতি তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১১৬টি কলেজ সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছেন বলে জানা যায়। সেসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা মিষ্টি বিতরণ করছেন। তাদের ফেসবুক অভিবাদনের স্ট্যাটাসে ভরে গেছে। পাশের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ফেস ভরে গেছে হতাশার কালো মেঘে। অন্যরাও ফাইলপত্র নিয়ে নানাদিকে ছুটছেন কপাল বদলাতে। কারো কারো ললাটের লিখন হয়তো বদলাবেও। এতে মুষ্টিমেয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী লাভবান হলেও পাকিস্তান স্টাইলের শোষণ-বঞ্চনা চলতেই থাকবে।

শেখ হাসিনার তিন দফার শাসনামলেও মূলত পাকিস্তানি ধারায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি করা হয়েছে ও হচ্ছে। বিষয়টি বেদনার ও হতাশার। যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত আমলে জাতির জনকের পথ অনুসরণ করে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কয়েক ধাপে সরকারি করেছেন, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন ১৫০০টি গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করছেন সেখানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি ধারা বহাল রেখে সরকারি করাটা বোধোগম্য নয়। এভাবে সরকারিকরণ চললে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য আরও প্রকট হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধার ভিন্নতার কারণে হতাশা বাড়বে। সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত এবং আত্তীকৃত শিক্ষকদের মধ্যকার বিরাজমান দ্বন্দ্ব আরও বাড়বে। এদের মধ্যে ইতোমধ্যেই সিনিয়রিটি ও পদোন্নতিবিষয়ক মামলা মোকদ্দমা চলছে। শিক্ষা পণ্যে পরিণত হয়েছে। সরকারিকরণের বর্তমান প্রক্রিয়া চলতে থাকলে শিক্ষাপণ্য সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাবে। শিক্ষার মানের বিরাজমান বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা জাতি। কাজেই সরকারিকরণের বর্তমান ধারা হতে বের হওয়াটা জরুরি। এখনই ফিরে যেতে হবে জাতীয়করণের পথে।

এতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে। আর রাষ্ট্রের মালিকও তো জনগণ! আমরা অনেকেই সরকারিকরণ (Government) এবং জাতীয়করণ (Nationalization) বিষয় দুটোকে গুলিয়ে ফেলি। সরকারিকরণ মানে কারিকুলাম, সিলেবাস, শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও বেতন-ভাতা পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা। আর জাতীয়করণ মানে শুধু নিয়োগ, পদোন্নতি ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা থাকবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়নে শিক্ষকদের স্বাধীনতা ও অংশগ্রহণ থাকবে। অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি কর্মচারী হবেন না। অর্থাৎ শিক্ষার আর্থিক দায় পুরোপুরি রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। আর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা থাকবে বেসরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত। এতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ থাকবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটিও এর সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা জাতীয়করণের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পেতে আমরা আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ভারতের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল হতেই এমন ব্যবস্থা সেখানে চালু হয়েছে। প্রথমে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা রাজ্যে। বর্তমানে সাড়া ভারতে এই পদ্ধতি চালু আছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার আগের ১৬টি সরকারি কলেজের সংখ্যা এখনও অপরিবর্তিত আছে।

স্বাধীনতার পরে ভারতের অন্য কোন রাজ্যেও সরকারি স্কুল-কলেজ স্থাপন করা হয়নি বা কোন বেসরকারি স্কুল-কলেজকে সরকারি করা হয়নি। উল্লেখ্য, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (JUGC) মাধ্যমে প্রণীত অভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ দান করা হয়। একই নীতিমালার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পদায়ন, পদোন্নতি, বেতনক্রম, পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য ভাতা নির্ধারিত হয়। স্বতন্ত্র স্কুল ও কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে ভারতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১৯৮৬ সাল হতে সমগ্র ভারতে এ ব্যবস্থা কার্যকরী রয়েছে। ভারতে সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ঈর্ষণীয়। যার ফলশ্রুতিতে সারা ভারতে শিক্ষার উচ্চমান বজায় রয়েছে। বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস) এর প্রতিষ্ঠালগ্ন (৪ জুন/১৯৮৪) হতেই শিক্ষা জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে আসছে। আজ সহযাত্রী অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনও বিষয়টির মর্মকথা অনুধাবন করতে পারছে। জাতীয়করণ করতে গিয়ে প্রথমে ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন সরকার নিয়ে নিতো। পরবর্তীতে ভারতে ছাত্র বেতন আর সরকার নিচ্ছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কল্যাণেই তা ব্যয় করা হচ্ছে!

অনেকেই বলে থাকেন জাতীয়করণ একটি অবাস্তব ধারণা। বিষয়টি মোটেও তা নয়। বরং এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সাম্যের বাণী। বৈষম্যহীন শিক্ষার বাস্তবায়ন একমাত্র শিক্ষা জাতীয়করণের মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের দেশে ২০০৫ সাল হতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছে। পৃথক শিক্ষক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা গেলে আরও মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হবে। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শিক্ষার জাতীয়করণ কয়েক ধাপে হতে পারে। যেমনটি হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। আর অর্থের অভাবের যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, দেশে টাকার কোনো অভাব নেই এবং অপচয়েরও ভুরি ভুরি নজির আছে। আবার অর্থ বছর শেষে অনেক মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট বাজেটও খরচ করতে পারে না। সেখানে শিক্ষার মতো মানবিক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টাকার অভাবের যুক্তি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিলে চলবে না। গাছের গোড়ায় সারের মাত্রা বেশি দিলেই ফলন ভালো হয় না। কখনো কখনো এতে গাছ মারাও যায়।

কাজেই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। পাশাপাশি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের টিউশন ফি, দোকানপাট, জমিজমা ও পুকুর অর্থাৎ যাবতীয় আয় সরকার নিয়ে নিলে অর্থের বড় জোগান হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ। জিডিপির ৫ শতাংশ আমাদের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করার কথা থাকলেও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ। যা গত বারের ২.২ শতাংশের চেয়েও কম। শিক্ষার বিনিয়োগ যে বিফলে যায় না তা অন্যান্য দেশের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান পাহাড়সম বৈষম্যকে জিইয়ে রাখার কৌশল এখনই পরিহার করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের যাত্রা শুরু করতে হবে। স্বাধীনতার পর ৪৩ বছর পেরিয়ে গেছে। আর কত সময় প্রয়োজন? এ ব্যাপারে জরুরিভাবে ভাবা দরকার। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি শোষণ ও বঞ্চনার সরকারিকরণের নীতি চলমান থাকতে পারে না। অবিলম্বে জাতীয় স্বার্থে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সরকারিকরণ নীতিতে অথবা ভারতীয় জাতীয়করণের নীতিতে ফিরে যেতে হবে।

তবে ভারতীয় জাতীয়করণের ধারণা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণকেই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে বাকবিশিস মনে করে। আবার ভারতীয় পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করতে হবে এমন কথাও নেই। শিক্ষক সংগঠনসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে এবং দেশজ পটভূমি বিবেচনা করে সরকার বিকল্প কোন পদ্ধতিও চালু করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষক সংগঠনসমূহের ঐক্য ও সুস্পষ্ট নীতিমালা। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কলেজ টিচার্স অর্গানাইজেশন (আইফুক্টো) এর একতার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের শিক্ষক সংগঠনসমূহ অনুসরণ করতে পারে। শুধুমাত্র মাথাপিছু আর্থিক প্রবৃদ্ধির মাত্রা বিবেচনা করে দেশকে মধ্য বা উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে বিবেচনা করাটা খুব যৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না। দেশে প্রকৃত মানবিকবোধ সম্পন্ন মানবের সংখ্যা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। একমাত্র বৈষম্যহীন ও মানসম্পন্ন শিক্ষাই পারে সে কাজটি করতে। অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি উন্নত ও সমতাভিত্তিক শিক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় দেশ অচিরেই দানবে ভরে যাবে। তখন মুষ্টিমেয় মানব আর বাঁচতে পারবে না। সে হবে এক বন্য দুনিয়া!

[লেখক : বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, ঝিটকা খাজা রহমত আলী ডিগ্রি কলেজ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ]

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

স্বাক্ষর